



ଶର୍ମ୍ପ୍ରାୟ ୧

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ତଥ୍ୟାଙ୍କ

ঐৰ্�ধ্যায়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

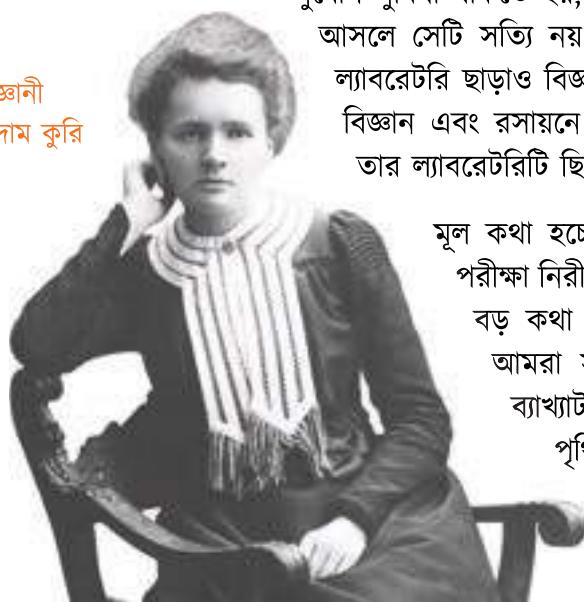
এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- বিজ্ঞানের ধারণা, প্রযুক্তির ধারণা
- বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তি
- ভালো প্রযুক্তি, খারাপ প্রযুক্তি
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া
- বিভিন্ন রাশির পরিমাপ, বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের পদ্ধতি
- ছোট ও বড় ক্ষেত্রে পরিমাপ
- প্রয়োজনে নিখুঁত পরিমাপ
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা
- বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা
- বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের কথা বলতেই আমাদের কল্পনায় বড় বড় আধুনিক ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জটিল সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন, এরকম একটা ছবি তেসে ওঠে। সেজন্য অনেকেই মনে করে বিজ্ঞান চর্চা বুঝি সবাই করতে পারে না, এর জন্য বুঝি অনেক সুযোগ সুবিধা থাকতে হয়, বিজ্ঞানী হতে হলে অনেক মেধাবী হতে হয়।

আসলে সেটি সত্যি নয়, বিজ্ঞান সবার জন্য। অনেক বড় আধুনিক ল্যাবরেটরি ছাড়াও বিজ্ঞানের গবেষণা করা যায়। মাদাম কুরি পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নে দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু তার ল্যাবরেটরিটি ছিল একেবারেই সাদামাটা।



মূল কথা হচ্ছে বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি সবসময় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করা যায়। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা বিজ্ঞান হচ্ছে চিন্তার একটা পদ্ধতি যেখানে আমরা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করি এবং সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যাটাকেও যাচাই করে দেখি সেটি সত্যি কি না।
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর তত্ত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্ন করতে পারি এবং সেটি সত্যি কি না

পরীক্ষা করে দেখতে পারি। হাজার হাজার বছর থেকে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত যাচাই করে আসা হচ্ছে বলে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর কোনটা কতটুকু সত্যি সেটা আমরা জানি। যখন প্রয়োজন হয় তখন বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আমরা পরিবর্তন করি, কিংবা পরিমার্জন করি। সেজন্য বিজ্ঞানের উপর আমরা সবসময় নির্ভর করতে পারি।

বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে যাচাই করতে পারি, কিন্তু মনে রাখবে যে, সব ধরনের জ্ঞানই কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয়। আমাদের চারপাশে যে বাস্তব জগৎ আছে, সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। তাই ভালোবাসা, হিংসা বা নৈতিকতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে যে জ্ঞানটুকু গড়ে উঠছে সেটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঘটনা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র।

দুইজন বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান বিষয়টা সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবারে দুইজন বিজ্ঞানীর দুটি আবিষ্কারের কথা বলা যাক। একজন বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীর সবাই জানে আর অন্যজনকে দেখলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে তিনি একজন বিজ্ঞানী, তার কথা জানে শুধু আমাদের দেশের অল্প কিছু মানুষ।

স্যার আঠজাক নিউটন



নিউটনের কথা কে না জানে, বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তার যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে কিন্তু এখানে তুলনামূলকভাবে একটি সহজ আবিষ্কারের কথা বলা যাক। তিনি বলেছিলেন, সূর্যের আলোকে আপাতত রংহীন মনে হলেও এটি আসলে অনেকগুলো রং দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানী নিউটন যে সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন সেই সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সেরকম প্রচলন হয়নি। একজন বিজ্ঞানী কোনো তত্ত্ব দিলে সবাই মিলে সেটা নিয়ে আলোচনা করে বের করার চেষ্টা করতেন তত্ত্বটি সঠিক না ভুল।

বিজ্ঞানী নিউটন শুধু তার তত্ত্ব দিলেন না, একটি প্রিজম দিয়ে সূর্যের আলোকে ভাগ করে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি এটি করেই থেমে গেলেন না, আরেকটি প্রিজম দিয়ে সাতটি রংকে একত্র করে আবার বণহীন করে দেখালেন!

পরীক্ষা করে একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখানোর ফলে বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্বটি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

হরিপদ কাপালী



হরিপদ কাপালী ছিলেন যশোর এলাকার একজন সাধারণ চাষি। তিনি তার ক্ষেতে ইরি ধান লাগিয়েছেন, সেই ক্ষেতের ধান পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে দেখলেন- কিছু গাছ তুলনামূলকভাবে বড় এবং সেখানে ধানের ফলন হয়েছে বেশি। হরিপদ কাপালী একজন কৃষক হলেও তিনি আসলে বিজ্ঞানী, তাই সেই ধানগুলো অন্য ধানের সাথে মিশিয়ে না ফেলে সেগুলো আলাদা করে ফেললেন। তার বীজকে আলাদা করে করে সেগুলো আবার নতুন করে লাগালেন, তিনি দেখতে চাইলেন আসলেও সেগুলো উচ্চ ফলনশীল কি না। দেখা গেলো সেগুলো বেশ বড় হলো এবং অনেক বেশি ধানের ফলন হলো।

খাঁটি বিজ্ঞানীরা স্বার্থপর হন না, তাঁরা সবার জন্য কাজ করেন। হরিপদ কাপালীও তাঁর ধানের বীজ অন্যদের বপন করতে দিলেন এবং দেখতে দেখতে সেই এলাকার সকল চাষি উচ্চ ফলনশীল ধান পেতে লাগলো!

বিজ্ঞানী হরিপদ কাপালীর এই আবিষ্কারের কথা লোকমুখে অন্যরা জেনে যাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে। তাঁর ধানের নাম দেওয়া হয় হরি ধান, দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাকে পদক দিয়ে সম্মানিত করে এবং পাঠ্যবইতে তার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লেখা হয়।

তোমাদের এই দুইজন বিজ্ঞানীর কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে বোঝানোর জন্য যে, বিজ্ঞান আসলে শুধু বড় বড় ল্যাবরেটরি এবং দক্ষ অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের জন্য নয়। একজন সাধারণ মানুষের যদি বৈজ্ঞানিক মন থাকে তাহলে তিনিও বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারেন।

প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু যখন আমাদের জীবনের কোনো একটি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে বলে প্রযুক্তি। যেমন বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি- পদার্থের ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এবং এই বিদ্যুৎ আমাদের জীবনের অনেক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের রূপপুরে সেরকম একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দুইবার সেটি সরাসরি মানুষের উপর ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের অপূর্ব একটি জ্ঞানকে

প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের ভালো কাজে যেরকম ব্যবহার করা যায়, ঠিক সেরকম মানুষকে ধ্বংস করার কাজেও ব্যবহার করা যায়।

বিজ্ঞান যেহেতু একটা জ্ঞান এবং চিন্তার একটা প্রক্রিয়া তাই বিজ্ঞানের মাঝে খারাপ কিছু থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে যখনই কোনো একটা প্রযুক্তি গড়ে তোলা হয় সেটি কিন্তু যেরকম ভালো হতে পারে ঠিক সেরকম খারাপও হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে তোমাদের সেরকম একটা উদাহরণ দিয়েছি, সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নিউক্লিয়ার বোমা। ঠিক সেরকম জৈব রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ঔষধ তৈরি করা হয় আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে ভয়ানক মাদক তৈরি করা হয়, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধের উৎস।



আমরা শুরুতে বলেছি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে প্রযুক্তি বলি, যদি তোমরা তোমাদের চোখ কান খোলা রাখো তাহলে দেখবে মাঝে মাঝে সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের লাভ থেকে ক্ষতি বেশি হয়। যেমন পলিথিনের ব্যাগ, আমরা এই ব্যাগগুলো একবার ব্যবহার করে ফেলে দিই। এইগুলো অপচনশীল বলে আবর্জনার সাথে সাথে শেষ পর্যন্ত নদীর তলদেশ বা প্রকৃতিতে আশ্রয় নেয়, প্রথমে দেশের তারপরে পৃথিবীর পরিবেশের মহা বিপর্যয় ঘটাতে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি একটা কাপড়ের বা চট্টের ব্যাগ ব্যবহার করতো তাহলে কিন্তু এই সর্বনাশ হতো না। কাজেই তোমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে একবার ব্যবহারের উপর্যোগী পলিথিনের ব্যাগের এই প্রযুক্তিটি আসলে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি।

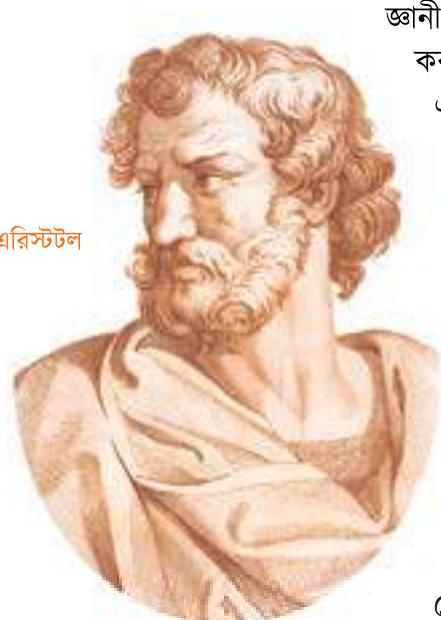
নিউক্লিয়ার শক্তি ভাল, খারাপ
দুইরকম কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে

আবার কিছু অসাধারণ চমৎকার প্রযুক্তি রয়েছে যেগুলো আমাদের জীবনযাত্রার মানের অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু সেই একই প্রযুক্তি একজন মানুষ অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এমনকি ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ তোমাদের সবার চোখের সামনেই রয়েছে, সেটি হচ্ছে স্মার্ট ফোন। স্মার্ট ফোন কত কাজে লাগে সেটা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না কিন্তু মাঝে মাঝে দেখবে কোনো একজন মানুষ সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেটি ব্যবহার করে নিজের সময় নষ্ট করছে। অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে করে অনেক তরুণ-তরুণী নিজেদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ যে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি হয়েছে, সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই মানুষের অকল্যাণ করা যায়, ক্ষতি করা যায়।

তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। বিজ্ঞান কখনো খারাপ হতে পারে না, কিন্তু প্রযুক্তি যদিও মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই তৈরি হয় কিন্তু সেটি ভালো হওয়ার পাশাপাশি খারাপও হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিংবা তার অপব্যবহারও হতে পারে। কাজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার আগে সবসময়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

এরিস্টটল



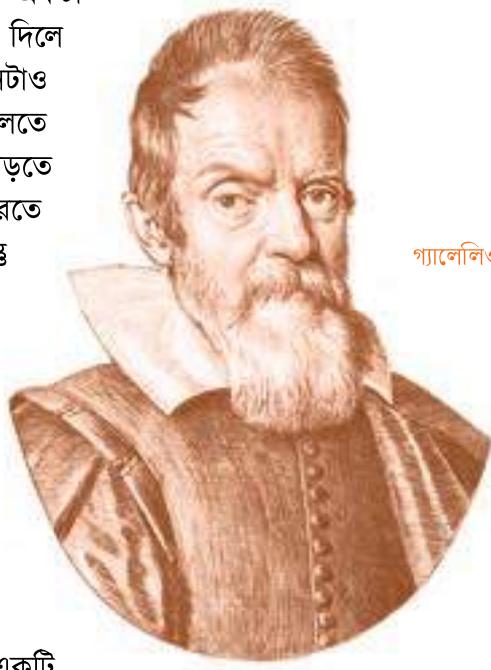
এরিস্টটল তাঁর সময়ের অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়কার জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুই চর্চা করতেন। তাই এরিস্টটলের বিজ্ঞান নিয়েও অনেক তত্ত্ব ছিল। একটি তত্ত্ব ছিল ভারী আর হালকা বস্তু নিয়ে। এরিস্টটল বলেছিলেন ভারী আর হালকা বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভারী বস্তুটি আগে নিচে পড়বে। সেই সময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথাকে সবাই গুরুত্ব দিত তাই দুই হাজার বছর ধরে সবাই বিশ্বাস করত সেটাই সত্যি।

বিষয়টা একটু চিন্তা করলেই কিন্তু খটকা লাগে। যদি ভারী জিনিস দ্রুত এবং হালকা জিনিস ধীরে নিচে পড়ে তাহলে দুটি একসাথে বেঁধে দিলে হালকা জিনিসটা ভারী জিনিসটাকে আর দ্রুত পড়তে দেবে না। আবার দুটি জিনিস একসাথে বেঁধে দিলে মোট ওজন আরও বেশি বলে সেটার আরও দ্রুত পড়া উচিত। তাহলে কোনটা সত্যি? এই প্রশ্নের উত্তর কী?

যুক্তি তর্ক দিয়ে আমরা একটা উত্তর দাঁড় করতে পারি, যে
আসলে ভারী আর হালকা সব বস্তুই একসাথে

নিচে পড়বে। কিন্তু আমরা তো সেটা ঘটতে দেখি না—একটা পাথর আর এক টুকরা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দিলে সবসময়ই পাথরটাই আগে নিচে পড়ে। আমরা সেটাও ব্যাখ্যা করার জন্য একটা যুক্তি দাঁড় করতে পারি—বলতে পারি বাতাসের বাধার কারণে কাগজের টুকরার পড়তে সময় বেশি লাগে। বায়ুশূন্য জায়গায় পরীক্ষাটা করতে পারলে দেখব দুটো একই সময় নিচে পড়ছে। কিন্তু বায়ুশূন্য জায়গা পাওয়া খুব সহজ নয়, তাই ভারী বস্তুর সাথে খুবই ছোট আকারের হালকা একটা বস্তু নিতে পারি যেন বাতাসের বাধা বেশি না হয়। কথিত আছে পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে এরকম একটি ভারী আরেকটি হালকা বস্তু ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে গ্যালেলিও দেখিয়েছিলেন যে, ভারী এবং হালকা বস্তু একসাথে নিচে পড়ে।

উপরের উদাহরণটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি



গ্যালেলিও

সুন্দর উদাহরণ। এখনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটা এরকম। এখানে মোট ছয়টি ধাপ আছে, ধাপগুলো এরকম:

১। একটি প্রশ্ন যার উত্তর বের করতে হবে।

(উপরের উদাহরণে সেই প্রশ্নটি হচ্ছে ভারী না হালকা বস্তু কোনটা আগে নিচে পড়ে?)

২। এ সম্পর্কে যা কিছু গবেষণা হয়েছে তা জেনে নেওয়া।

(উপরের উদাহরণে সেটি ছিল এরিস্টটলের ব্যাখ্যা।)

৩। প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।

(উপরের উদাহরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে ভারী এবং হালকা দুটিই বস্তুই একসাথে নিচে পড়বে।)

৪। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি সত্যি কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা।

(উপরের উদাহরণে গ্যালেলিও সেটি পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে ভারী এবং হালকা বস্তু ফেলে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।)

৫। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া।

(উপরের উদাহরণে গ্যালেলিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর ধারণা সঠিক।)

৬। সবাইকে ধারণাটি জানিয়ে দেওয়া।

(গ্যালেলিও তার ধারণাটি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তখন অন্যরাও পরীক্ষাটি করে দেখেছিলেন।)



তোমরা যদি ইতিহাসের বড় বড় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো দেখো তাহলে দেখবে, সবসময়ই সেগুলো ঘটেছে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। আবার তোমাদের চারপাশের দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর জন্যও কিন্তু এটা সত্যি, তোমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর এভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেই পেয়ে যাবে।

মূল কথা হচ্ছে, বিষয়টা যদি বিজ্ঞানের বিষয় হয় তাহলে তার উত্তরটি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া নয়; সেটি যাচাই করে গ্রহণ করা হচ্ছে বিজ্ঞান। সবাই হয়তো বিজ্ঞানী হবে না কিন্তু সবাই বিজ্ঞানমনক্ষ হবে।

বিভিন্ন রাশির পরিমাপ

একটা পাথর উপরে ছুড়ে দিলে একসময় তা আবার নিচে এসে পড়ে। মানুষ প্রাচীন কাল থেকে এটা দেখে আসছে। কিন্তু এই জ্ঞানটুকু পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বলতে পারবে না যে—ঠিক কত জোরে কত ওজনের একটা পাথর কোনদিকে ছুড়ে দিলে কত সময়ে কত উপরে উঠে তা কত দূরে গিয়ে পড়বে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা করতে গেলে আমাদের সবকিছু পরিমাপ করে বলতে হয়।

যে সমস্ত বিষয় আমরা পরিমাপ করতে পারি সেগুলোকে রাশি বলে। কাজেই জ্বর ওঠার পর তোমার যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেটি হচ্ছে একটা রাশি, কিন্তু জ্বর ওঠার কারণে তোমার শরীরে যে খারাপ অনুভূতি হয় সেটি রাশি নয়। ঠিক সেরকম একটা রসগোল্লার ভর হচ্ছে রাশি, কিন্তু রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দ রাশি নয়। কাজেই তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে আমাদের অনেক রাশি পরিমাপ করতে হবে। রাশিগুলো পরিমাপ করার জন্য আমাদের সঠিক একক তৈরি করে নিতে হবে, যেমন দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার; ভরের জন্য কেজি কিংবা পাউন্ড ইত্যাদি। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে রাশি কতগুলো আছে? তাদের জন্য কতগুলো একক লাগবে? আমরা যদি কিছু রাশির কথা কল্পনা করতে চাই, তাহলে এক নিশ্চাসে বলে দিতে পারব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ওজন, ঘনত্ব, অবস্থান, বেগ, চাপ, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, রং, কাঠিন্য অর্থাৎ রাশির কোনো শেষ নেই। সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের একক কয়টি লাগবে?

আনন্দের কথা হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগতে অসংখ্য রাশি থাকলেও সেগুলো ব্যাখ্যা করতে মাত্র সাতটি রাশির জন্য সাতটি একক তৈরি করে নিলে সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের সব রাশি তৈরি করে ফেলতে পারব। সেই সাতটি রাশির চারটি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন ব্যবহার করো, সেগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা। (অন্য তিনটি হচ্ছে বৈদ্যুতিক কারেন্ট, পদার্থের পরিমাপ, আলোর ওজন, আরেকটু উপরের ক্লাসে তোমরা সেগুলো সম্পর্কেও জানবে।) পরিমাপের জন্য এককগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সবাই মিলে ঠিক করে রেখেছে। যদিও বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন একক প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত SI ইউনিটগুলো এরকম: দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার (m), ভরের জন্য কিলোগ্রাম বা কেজি (kg), সময়ের জন্য সেকেন্ড (s), তাপমাত্রার জন্য কেলভিন (K)। আমরা এবারে প্রচলিত এই চারটি এককের পরিমাপ নিয়ে আর একটু আলোচনা করি।

পরিমাপের পদ্ধতি

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ঠিকভাবে পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে গিয়ে যদি দেখো তোমাকে পাঁচ মাইল হাঁটতে হচ্ছে তাহলে দেড়গুণ থেকে বেশি হাঁটতে হবে। তোমার মা যদি তোমাকে পাঁচ কেজি চাল আনতে বলে আর তুমি যদি পাঁচ পাউন্ড চাল নিয়ে আস, তাহলে অর্ধেক থেকেও কম চাল আনবে! দৈনন্দিন জীবনে এরকম ভুলগুলি আমরা কোনোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ভুল মারাত্মক হতে পারে। পরিমাপে ভুল করেছিল বলে ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই এয়ার কানাডার যাত্রীবাহী একটি বোয়িং 767 বিমান মাঝপথে আবিষ্কার করল তার

জ্বালানি শেষ। বিদ্যুমাত্র জ্বালানি ছাড়াই দক্ষ পাইলট সেটিকে কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা রেস কোর্সে নামিয়ে আনতে পেরেছিল। আবার একই ধরনের পরিমাপের হেরফেরের কারণে নাসার (NASA) ১২৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি মহাকাশযান ১৯৯৯ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গল গ্রহে বিধ্বস্ত হয়েছিল। কাজেই পরিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

এবারে আমরা আমাদের পরিচিত চারটি একক বিজ্ঞানে ব্যবহারের উপযোগিভাবে দেখি।

দৈর্ঘ্য



দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে মিটার, সংক্ষেপে m। যদিও পাশাপাশি ইঞ্চিও এবং ফুটকেও দৈনন্দিন জীবনে এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা বিজ্ঞানের পরিমাপের জন্য এই বইয়ে মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ব্যবহার করব। তোমরা যারা একটা মিটার স্টিক হাতে নিয়েছ তারা মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় সেটা অনুভব করতে পেরেছ। মোটামুটিভাবে বলা যায় একজন মানুষের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দূরত্বটিকুই হচ্ছে এক মিটার। তবে একেবারে সঠিকভাবে এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য আগে একটি আদর্শ মিটারস্টিক ফালের একটি মিউজিয়ামে রাখা ছিল। এখন এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি মজার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আলোর বেগ অনেক বেশি, এটি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অচিন্ত্যনীয় আলোর বেগ ব্যবহার করে এক মিটার দূরত্ব বের করে ফেলেন। (তোমরা যখন একটু উপরের ক্লাশে উঠবে তখন সেটি কীভাবে করা যায় জানতে পারবে।) আলোর বেগ যেহেতু মহাবিশ্বের সব জায়গায় একই থাকে, তাই শুধু পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় নয় মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গায় এক মিটার দূরত্ব কতটুকু সেটা অনেক সূক্ষ্মভাবে বের করে ফেলা যাবে।

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঢাকা থেকে সিলেট কতদূর তাহলে তুমি দূরত্বটি মিটারে না দিয়ে কিলোমিটারে দেবে, এক কিলোমিটার হচ্ছে ১০০০ মিটার। ঠিক সেরকম যদি তোমাকে তোমার নখের দৈর্ঘ্য কত জিজ্ঞাস করা হয় তুমি সেই দৈর্ঘ্যটি মিটারে না বলে মিলিমিটারে বলবে, মিলিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। মিলিমিটারের পাশাপাশি সেন্টিমিটারেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। এক সেন্টিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগ কিংবা ১০ মিলিমিটার। মিলিমিটারে চাইতেও ছোট দৈর্ঘ্যের জিনিষ সাধরণত আমাদের খালি চোখে মাপ জোক করতে হয় না।

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাকে যদি কোনো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য বলতে হয় তাহলে তোমাকে বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করতে হবে দূরত্বটি মিটারে বলবে নাকি কিলোমিটারে বলবে কিংবা সেন্টিমিটারে বলবে নাকি মিলিমিটারে বলবে। সত্যি কথা বলতে কি তোমরা যখন মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে পড়বে তখন দেখবে আমাদের এর বাইরেও কাজের সুবিধার জন্য অন্য একটা একক ব্যবহার করতে হচ্ছে।

ডর



ভরের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা সংক্ষেপে কেজি (kg)। এক সময় ‘আসল’ এক কেজি একটা ভর ফ্লাসের একটি মিউজিয়ামে রাখা হতো। ২০১৯ সালের মে মাস থেকে ‘আদর্শ’ বা ‘আসল’ এককের জন্য কোনো মিউজিয়ামে রক্ষা করা ভরের উপর নির্ভর করতে হয় না। বিজ্ঞানের কিছু ধ্রুব থেকে সেগুলো বের করে ফেলা যায়।

সম্ভবত আমরা আমদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি বার কেজি ব্যবহার করি। যেহেতু আমরা আজকাল পানি কিংবা সফট ড্রিংকের বোতলে অভ্যন্ত হয়ে গেছি তাই বলতে পারি এক লিটারের বোতল বোঝাই পানি কিংবা সফট ড্রিংকের ভর হচ্ছে এক কেজি। কিংবা সাধারণ ফ্লাসের চার ফ্লাস পানির ভর হচ্ছে এক কেজি।

তোমাদের কারো কারো মনে হয়তো খটকা লাগছে যে আমরা ওজন মাপার জন্য কেজি ব্যবহার করি, আমাদের ওজন ৩০ কেজি বলতে আমরা খুবই অভ্যন্ত, তাহলে প্রচলিত ওজন শব্দটা ব্যবহার না করে বার বার ভর কথাটা কেন ব্যবহার করছি?

তার কারণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ভাষায় ভর আর ওজনের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য। ভরের একক হচ্ছে কেজি। ওজনের অন্য একটি একক, তোমরা উপরের ফ্লাসে সেগুলো জানবে। কাজেই বিজ্ঞানের ভাষায় তোমার ওজন ৩০ কেজি কথাটি ভুল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না! এক ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করে; পৃথিবীর ভর যেহেতু অনেক বেশি তাই তার আকর্ষণটাও বেশি, এই আকর্ষণটাই আসলে ওজন। চাঁদের ভর যেহেতু পৃথিবীর ভর থেকে কম তাই তুমি যদি চাঁদে যাও তাহলে দেখবে সেখানে তোমার উপর চাঁদের আকর্ষণও কম। অর্থাৎ তোমার মনে হবে তোমার ওজনও কম, এক লাফে তুমি অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে। কাজেই পৃথিবী এবং চাঁদ দুই জায়গাতেই তোমার ভর ৩০ কেজি হলেও পৃথিবী এবং চাঁদে তোমার ওজন ভিন্ন!

দৈর্ঘ্যের বেলায় দেখেছি মিটারের পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভরের জন্যও কেজির পাশাপাশি পাউন্ড ব্যবহার হতো তবে আজকাল সেটি তুলনামূলকভাবে কম। দৈর্ঘ্যের বেলাতে আমরা কম কিংবা বেশি দূরত্ব বোঝানোর জন্য সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার ব্যবহার করেছি, ভরের বেলাতেও তাই। কম ভরের বেলায় আমরা গ্রাম (g) ব্যবহার করি যেটা কিলোগ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তার চাইতেও কম ভর মাপার জন্য আমরা মিলিগ্রাম (mg) ব্যবহার করি যেটা গ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তোমরা গুরুত্বের ট্যাবলেটে দেখবে সেখানকার সক্রিয় উপাদানটির পরিমাণ সবসময় mg -এ দেওয়া থাকে।

সময়



যতগুলো রাশি আছে তার মধ্যে সময় রাশিটি নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত রাশি। এর মূল এককটি নিয়ে পৃথিবীতে কোনো বিভাজন নেই। সবাই সেকেন্ডকে (s) সময়ের একক হিসাবে মেনে নিয়েছে। খাঁটি বিজ্ঞানের বেলায় এক সেকেন্ড ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পনের সময়কে ধরে নিলেও আমরা মুখে ‘এক হাজার এক’ কথাটি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে এক সেকেন্ড হিসেবে অনুভব করতে পারি। দৈর্ঘ্য এবং ভরের বেলায় কিলোমিটার এবং কিলোগ্রাম থাকলেও সময়ের বেলায় কিলোসেকেন্ড নেই! তোমরা সবাই জানো ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট এবং ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা ধরে নেয়া হয়। তবে কিলোসেকেন্ড না থাকলেও মিলিসেকেন্ড আছে। সেটি হচ্ছে ১ সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের এক ভাগ, তবে এই সময়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করার জন্য বেশ ছোট।

আমাদের চারপাশে ১ সেকেন্ডের কাছাকাছি অনেক উদাহরণ আছে। আমাদের হৃদস্পন্দন সেকেন্ডে ১ বার করে হয়, কারো একটু বেশি, কারো একটু কম। আমরা চোখের পাতা ফেলি প্রতি দুই সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। নিশ্বাস নেই প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম!

তাপমাত্রা



আমরা সবাই কখনো না কখনো বলেছি ‘গরম লাগছে’ কিংবা ‘ঠাণ্ডা লাগছে’। আমরা এটাও জানি চা গরম এবং আইসক্রিম ঠাণ্ডা- গরম এবং ঠাণ্ডা কথাটি দিয়ে আমরা আসলে বোঝাই ‘তাপমাত্রা’ নামক রাশিটি তুলনামূলকভাবে বেশি বা কম। কাজেই আমরা আসলে তাপমাত্রাটি আমাদের শারীরিক অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি, অবশ্যই যদি সেটা আমাদের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কেলভিন (K), যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপমাত্রার জন্য যে এককটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে সেলসিয়াস ($^{\circ}\text{C}$)। এই এককে পানি জমে বরফ হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে 0°C এবং পানি ফুটে বাস্প হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে 100°C । তবে মজার বিষয় হচ্ছে কেলভিন এককের বেলাতেও পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা এবং বরফের তাপমাত্রা পার্থক্য 100 K ।

অর্থাৎ কোনো কিছুর তাপমাত্রা 10°C বেড়ে গিয়েছে বলা যে কথা 10 K বেড়ে গিয়েছে বলা একই কথা। স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করতে পার এই দুটি এককের মধ্যে পার্থক্য কী?

পার্থক্য হচ্ছে 273.15° !

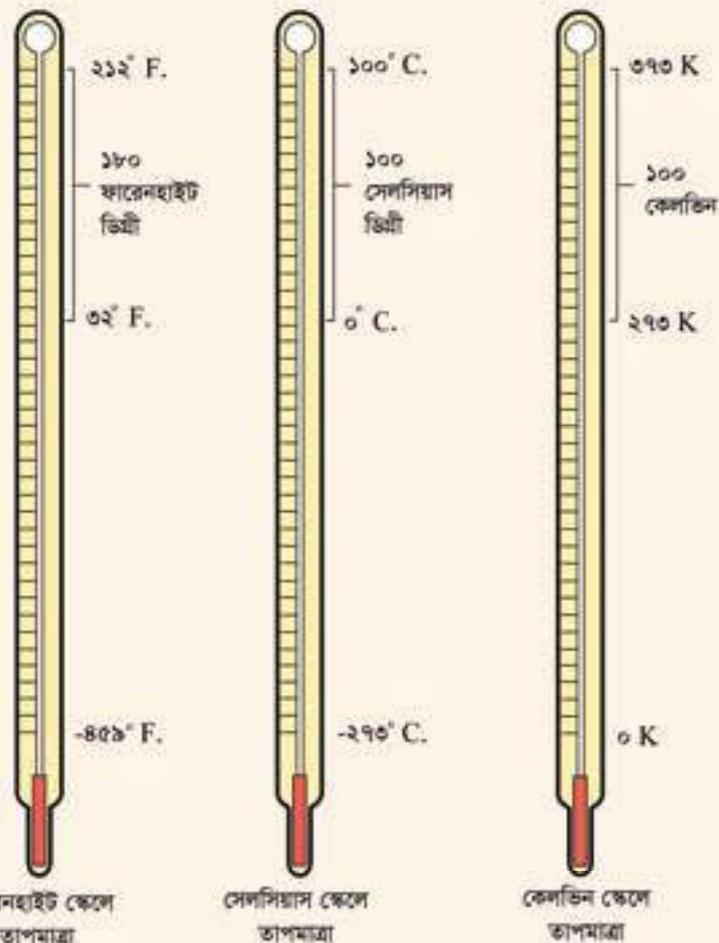
অর্থাৎ সেলসিয়াস
ক্ষেলের তাপমাত্রার
সাথে 273.15 যোগ
করলে কেলভিন
ক্ষেল পাওয়া যায়।
অর্থাৎ কেলভিন ক্ষেল
বরফের তাপমাত্রা
হচ্ছে $0 + 273.15 =$
 273.15 K এবং পানি
বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা
হচ্ছে $100 + 273.15$
 $= 373.15$ K!

স্বাভাবিকভাবেই তুমি
তাহলে প্রশ্ন করবে
সেলসিয়াসের এত
সহজ সরল ক্ষেলের
সাথে এই বিচিত্র একটি
সংখ্যা যোগ দিয়ে
কেলভিন ক্ষেল তৈরি
করার কারণ কী?

কারণটি কিন্তু অত্যন্ত
চমকপ্রদ। তুমি যে
কোনো কিছুর তাপমাত্রা

যত ইচ্ছা বাঢ়তে পারবে, তার কোনো সীমা নেই! কিন্তু তাপমাত্রা যত ইচ্ছা করাতে পারবে না।
তাপমাত্রার একটা সর্বনিম্ন মান আছে। সত্যি কথা বলতে কী তুমি এই তাপমাত্রার কাছাকাছি
যেতে পারবে কিন্তু কখনই সেই তাপমাত্রায় পৌছাতে পারবে না। এটাকে বলে পরম শূন্য
তাপমাত্রা। কেলভিন ক্ষেলটি তৈরি করা হয়েছে এই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রী ধরে। সেলসিয়াস
ক্ষেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে -273.15° তাই সেলসিয়াস ক্ষেলের সাথে 273.15 যোগ দিলে
কেলভিন ক্ষেল পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেলসিয়াস ক্ষেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট নামে আরও একটি তাপমাত্রা ক্ষেল কোনো
কোনো দেশে এবং জ্বর মাপার থার্মেমিটারে ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেলে বরফের তাপমাত্রা
 32°F এবং ফুটন্ট পানির তাপমাত্রা 212°F । ফারেনহাইট ক্ষেলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা
 98.6°F সেলসিয়াসে যেটা 37°C ।



মৌলিক একক এবং যৌগিক একক

আমরা দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা এই চারটি রাশি পরিমাপ করার জন্য এককের কথা বলেছি। সেগুলো হচ্ছে মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড এবং কেলভিন। এগুলো হচ্ছে মৌলিক একক। কাজেই আমরা যদি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে শুধু মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি একটা ঘরের ক্ষেত্রফল মাপতে চাই তাহলে সেটা মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। ঘরটির দৈর্ঘ্য যদি ৫ মিটার এবং প্রস্থ ২ মিটার হয় তাহলে ঘরটির ক্ষেত্রফল,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} = 5 \text{ মিটার} \times 2 \text{ মিটার} = 10 \text{ বর্গমিটার}$$

যেহেতু এককটি ‘বর্গমিটার’ তাই সেটাকে আমরা বলব যৌগিক একক। ঠিক একটা গাড়ী যদি ৩ সেকেন্ডে ১৫ মিটার যায় তাহলে তার বেগ হচ্ছে

$$\text{বেগ} = 15 \text{ m} / 3 \text{ s}$$

$$= 5 \text{ m/s}$$

প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার বা ৫ m/s।

এবারের এককটি হচ্ছে মিটার/সেকেন্ড, এটিও দুটি ভিন্ন একক দিয়ে তৈরি হয়েছে। কাজেই এটা হচ্ছে যৌগিক একক।

অনুশীলনী

?

- ১। তোমরা নিশ্চয়ই পিঁপড়াকে সারি বেঁধে যেতে দেখেছ। সারিটি ভেঙে দিলেও কিছুক্ষণের ভেতর পিঁপড়ারা আবার তাদের সারিটি তৈরি করে ফেলে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটি ব্যবহার করে তোমরা কি বের করতে পারবে পিঁপড়া কীভাবে এটি করে?
- ২। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ছয়টি ধাপের মাঝে কোনটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?
- ৩। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানমনস্ক এই দুইটির মাঝে পার্থক্য কী?
- ৪। ধরা যাক চাঁদে তুমি একটা মুদির দোকান দেবে। সেই দোকানে বেচা-কেনা করার জন্য তুমি কি দাঢ়িপাণ্ডা ব্যবহার করবে নাকি স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করবে? কেন?
- ৫। লম্বা সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথর ঝুলিয়ে সেটা দুলতে কত সময় নেয় বের করো। এখন সুতার দৈর্ঘ্য এবং পাথরের ভর বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দোলনের সময় বের করে দেখ সেটার কি কোনো পরিবর্তন হয়?
- ৬। $T_F = (T_C \times 9)/5 + 32$ তুমি এই সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়সে তাপমাত্রা (T_C) দেওয়া থাকলে সেটি ফারেনহাইটে (T_F) কত হবে বের করতে পারবে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট দুই ক্ষেত্রেই তার মান সমান, সেটি কত বের করতে পারবে?